আদমজী পাটকলের বিলুপ্তি এবং বাংলাদেশে শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ[1]

ড. আবুল বারকাত

সারকথা: বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল– আদমজী পাটকল– বিলুপ্ত করা হয়েছে। এ ঘটনা শিল্পায়ন বিরোধীতার এক সিমবল্। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের আওতায় একরৈখিক, একচেটিয়া পুঁজির নিয়ামক ভূমিকা আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশের দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতির প্রভাবের মধ্যে কৃষি-শিল্প-সমৃদ্ধ উৎপাদনশীল অর্থনীতির ভিত্তি বিনির্মাণ অসম্ভব ও দুঃসাধ্য। অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন সমাজ, রাজনীতি আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেও দুর্বৃত্তায়িত করেছে। পুরো কাঠামোর এ দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া রোধ করা ছাড়া জনকল্যাণ ও শিল্পায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বিষয়টি সামাজিক-রাজনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখানে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গভীর মানবিকগুণাবলীসমৃদ্ধ সাহসী নেতৃত্বের বিকল্প নেই। বিকল্প নেই নির্মোহ সত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নের। বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে অধিক হারে দুর্বৃত্তায়নের শিকার। অর্থনীতির এ দুর্বৃত্তায়ন রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদকে করছে আরও শক্তিশালী। সমগ্র শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থা এখন আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বেষ্টিত। আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক এ দুর্বৃত্তায়নরোধে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নসহ জনকল্যাণমুখী উত্তরণে রাজনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি। রাজনৈতিক এ পরিবর্তনে উষ্ণহৃদয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গভীর মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ সাহসী দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বিলম্ব অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে বিধায় কাঠামোগত এ পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য মুক্তি-স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় এমন এক কার্যকরী ন্যূনতম জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: মূল প্রবন্ধ রচনাকালে প্রবন্ধকার বিষয়বস্তুর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকেই নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন – নিজের মত করে। তাদের সবার প্রতি নিবন্ধকার কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা উদ্রেগকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে যারা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন ড. সায়েদুল হক খান, অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. শফিক-উজ-জামান, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. অভিজিৎ পোদ্দার, জনমিতি গবেষক; ড. জামাল উদ্দিন, হিসাব বিজ্ঞানি ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য; জনাব আয়ুব আলি, শ্রমিক নেতা; ডা. এ কে এম মুনীর, সচেতন চিকিৎসক; ড. শশাঙ্ক দাস গুপ্ত ও জনাব এ কে এম মাকসুদ, সমাজ বিজ্ঞানি; জনাব নূর আহমেদ, প্রাক্তন ছাত্র নেতা; জনাব মাহমুদ জামাল কাদেরী, উপদেষ্টা, সম্মিলিত রিকসা-ভ্যান চালক-মালিক পরিষদ, এবং ড. সাইফুল হক, সমাজ-সচেতন ব্যবসায়ী। সম্পাদনায় সহযোগিতার জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক অরুণাভ সরকারের প্রতি প্রবন্ধকার সবিশেষ কৃতজ্ঞ। স্বল্পসময়ে অতিদ্রুত সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি কয়েকদফা টাইপ করার জন্য মানব উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জনাব মোজাম্মেল হক ও মুদ্রণে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য কাশেম-নাহার প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের ইঞ্জিনিয়ার আবুল হাসেম, ড. আবুল হুসসাম ও নুরুল আজমের কাছে প্রবন্ধকার চিরঋণী। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে প্রবন্ধ রচনায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্রের প্রধান ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আর বিশেষ করে তাগাদা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ড. জাহেদা আহমেদ, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ড. আকমল হোসেন, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ঋণ অপরিশোধ্য।

[1] সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র আয়োজিত 'আদমজী পাটকল বিলুপ্তি এবং বাংলাদেশে শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে উপস্থাপিত/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তন, ঢাকা: ৩১ ডিসেম্বর ২০০২/১৭ পৌষ ১৪০৯

আদমজী পাটকলের বিলুপ্তি : যা বলা হয়েছে আর যা বলা হয়নি

আদমজী পাটকলের তাঁত সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৩০০। এটিই ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল। ২০০২ সালে কলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা আমাদের অর্থনীতির সাধারণ কোনো ঘটনা নয়। এ নিয়ে যা কিছু বলা হয়েছে আর যা বলা হয়নি, তা সবই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়। বিষয়গুলো হচ্ছে :

এক. তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জনগণের কল্যাণসংশ্লিষ্ট জরুরি বিষয়ে পুর্ণাঙ্গ সব তথ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব (উন্নয়নের পূর্বশর্ত যে 'স্বচ্ছতার গ্যারান্টি,' এক্ষেত্রে তা ভঙ্গ করা হচ্ছে)।

দুই. বিশ্বায়নের যুগে একচেটিয়া পুঁজির নিঃশর্ত বিকাশে তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়ন-সম্ভাবনা রুদ্ধ করতে হবে (অর্থাৎ সমগ্র বাজার-ব্যবস্থা রাখতে হবে কেন্দ্রের অধীন; এক্ষেত্রে ১নং শর্তের উপস্থিতি জরুরি)।

তিন. তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া রুদ্ধ করতে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থা খুবই তৎপর (অর্থাৎ ২ নং শর্ত বাস্তবায়নে কার্যকর মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান থাকতেই হবে)।

চার. তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তস্থ সমাজ-অর্থনীতিকে কেন্দ্রস্থ একচেটিয়া পুঁজির অধীন রাখার স্বার্থে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ শক্তিশালী করাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা (অর্থাৎ ২ নং শর্ত কার্যকরী করতে তৃতীয় বিশ্বে নিকৃষ্ট পুঁজির বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে)।

পাঁচ. তৃতীয় বিশ্বে স্ব-চালিত কল্যাণমুখী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি বিনির্মাণ দুঃসাধ্য

(১,২,৩ ও ৪ নং শর্ত কার্যকর হলে)।

ছয়. প্রান্তস্থ তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশে উন্নয়নের একই পদ্ধতি কার্যকর নয়; সুদূর প্রান্তস্থ অর্থনীতিতে শিল্প-বিকাশ রুদ্ধ করতে প্রান্তের কোনো কোনো অর্থনীতিকে এজেন্সি-পুঁজির বিকাশে ছাড় দিতে হবে (যেমন ভারতের পুঁজির বিকাশের স্বার্থে এখানে যখন পাটকল বন্ধ হবে তখন ভারতে চালু হবে নতুন পাটকল। আমাদের পাটকল বন্ধ করা ও ভারতে পাটকল প্রতিষ্ঠা করা, উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে মধ্যস্থতাকারী বিশ্বব্যাংক)।

পাকিস্তানী এক পুঁজিপতি ১৯৫১ সালে তার পারিবারিক নামে আদমজী পাটকল স্থাপন করে। এদেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পাটকলটি ভূমিকা রেখেছিল। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা উপাজর্নের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল পাটকলটি। পাটের রপ্তানি আয়ের উপর ৩৫% বোনাস ভাউচার (ভর্তুকি) পেয়ে পাটশিল্প লাভজনক শিল্পে রূপান্তরিত হয়। আদমজীর অনুপ্রেরণায় অন্যান্য পাট ও সুতাবস্ত্রকল স্থাপনের মাধ্যমে এদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ আর জাতীয় পুঁজির বিকাশের ধারা। ১৯৭১-এর আগে এসব শিল্প কারখানা যথেষ্ট লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পরে পশ্চিম-পাকিস্তানী মালিকদের ফেলে যাওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কলকারখানা বাংলাদেশ সরকার অধিগ্রহণ করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত প্রকৃতপক্ষে কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হিসেবে দেখা দেয়। সরকারি আমলা, মন্ত্রী-এমপি, নেতা-কর্মী, মিলের দুর্নীতিবাজ ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিবিএ নেতা, ব্যবসায়ী— এদের সকলেরই কালো কারবারের চারণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় রাষ্ট্রায়ত্ত খাত। মিল পরিচালন, পরিকল্পনা, ক্রয়-বিক্রয়— কোনো কিছুতেই শ্রমিকদের কোনো ধরনের অংশগ্রহণ কখনও ছিল না। এ ধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত খাত আর যাই হোক সমাজতন্ত্রের সমার্থক নয়। নব্বইয়ের দশকে মিলের উৎপাদন সংকোচন নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্ত আমলাতান্ত্রিক ব্যয়সহ বিভিন্ন ধরনের অনুৎপাদনশীল ব্যয় বৃদ্ধি রাখা হয় অব্যাহত। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে এসব উল্লেখ করা হয় না। বলা হয়, আদমজীর এক হাজার ২০০ কোটি টাকা লোকসান বা দেনার কথা। তারা তাদের জুট সেকটর রিস্ট্রাকচার প্রোগ্রাম (জুট সেকটর এ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট)-এর আওতায় আদমজীসহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত মিল-কলকারখানা বন্ধ এবং/অথবা ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর

করাটা আমাদের দেশের জন্য উন্নয়ন সহায়ক বলে মন্তব্য করে[২]। অর্থাৎ চূড়ান্ত বিচারে যা সৃষ্টির সামর্থ্য নেই তা ধ্বংস করাটাই অভিষ্ট।

বলা হয়েছে, ৩ হাজার ৩০০ তাঁত সজ্জিত আদমজী পাটকল গত তিন দশকে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। এ লোকসান দূর করতে পারলে বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের লোকসান এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাবে (বিশ্ব ব্যাংকের বক্তব্য)*। লোকসানের এ হিসেব কিভাবে করা হ'ল, তা কখনও প্রকাশ করা হয়নি। সামাজিক কস্ট-দুর্নীতি বেনিফিট প্রসঙ্গ বাদই দিলাম। এমনকি আর্থিক কস্ট-বেনিফিট-এর হিসেবও বিচার-বিশ্লেষণের জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে কখনও পেশ করা হয়নি। এসব হিসেবপত্তরের পদ্ধতি সম্পর্কেও আমরা জানতে পারলাম না। প্রকৃতপক্ষে আদমজী পাটকল আদৌ লোকসানি প্রতিষ্ঠান কিনা– এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ লাভ-ক্ষতির সাধারণ পাটিগণিতিক হিসেব তা নির্দেশ করে না। আর আদমজীতে প্রত্যক্ষ এবং আদমজীকেন্দ্রিক পরোক্ষ কর্মসংস্থান, কৃষি-অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব এবং বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক তন্তুর প্রকৃত চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় 'লোকসান' নেহায়েত অজুহাত মাত্র। আসলে পূর্বে উল্লিখিত গভীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ কার্যকরী করতেই আদমজীকে লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো জরুরি হয়েছিল।

আদমজী পাটকল বিলুপ্ত হয়েছে ৩০ জুন (২০০২)। পূর্ববর্তী ৩১ বছরে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার লোকসানের ওজুহাত দেখানো হয়েছে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণে সহায়ক হতে পারে এমন অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য (যতটুকু জানা গেছে) দেওয়া হয়নি। গোপন করা হয়েছে। তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আমাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বলা হয়নি অনেক কিছু যা বললে আদমজী বন্ধের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব হ'ত না। সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ যেসব কথা বলা হয়নি, তার মধ্যে অন্যতম হ'ল :

এক. বলা হয়নি, গত তিন দশকে আদমজী আয় করেছে ৩ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা (অথচ বলা হয়েছে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা লোকসানের কথা); এর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা রয়েছে দুই হাজার ২৩৮ কোটি টাকার সমপরিমাণ।

দুই. গত তিন দশকে আদমজী বিভিন্ন কর বাবদ সরকারকে পরিশোধ করেছে ৯০০ কোটি টাকা; ব্যাংকের সুদ বাবদ পরিশোধ করেছে প্রায় ৩৭০ কোটি টাকা আর বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছে ২০০ কোটি টাকা।

তিন. বলা হয়নি, আদমজীর প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক বেকার আর মিলের আশে-পাশে কর্মরত ৩০ হাজার মানুষ কর্মহীন হলে তাদের পরিবার পরিজনসহ পাঁচ লাখ নির্ভরশীল মানুষের কি হবে?

চার. চিন্তা করা হয়নি, এলাকার পাঁচটি স্কুলের ছয় হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে?

পাঁচ. সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা একটুকুও ভাবেননি যে, আদমজীর পাট-চাহিদা-নির্ভর এক কোটি কৃষক পরিবারের কি হবে?

ছয়. বিশ্ব ব্যাংকের ২৫ কোটি ডলার 'জুট সেকটর এ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিটের' আওতায় বাংলাদেশে যখন পাট শিল্প বিলুপ্ত হচ্ছে ঠিক তখনই একই বিশ্ব ব্যাংক ২৫ কোটি ডলার সাহায্য দিচ্ছে ভারতের পাট শিল্প বিকাশে। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক অন্যান্য সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ পাটকল ধীরে ধীরে বন্ধ করার কথা বলেছে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন হ'ল, পাটকল ডাউন সাইজ করে উৎপাদন ক্ষমতা কমাও, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দাও, কিছু কল বন্ধ কর (যুক্তি যা-ই হোক না কেন)। উল্লেখ্য যে, ঠিক আদমজী বন্ধ করার সময়ই ভারতের পশ্চিম বাংলায় নতুন ৪টি পাটশিল্প

---

[২] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Bangladesh Review of Public Enterprise Performance and Strategy: Key Issues and Policy Implications, World Bank: November 2002, Dhaka, PP. 55-59।

স্থাপন করে ১০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। কেন? অর্থনীতি শাস্ত্রের কোন তুলনামূলক সুবিধের (comparative advantage) কারণে এমনটি হচ্ছে? নাকি রাজনীতি ও জাতীয় পুঁজির বিকাশ এসব সিদ্ধান্তে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে?

সাত. আদমজী জুট মিলের ৩০০ একর জমি ও কয়েক হাজার কোটি টাকার অস্থাবর সম্পদের কি হবে? এসব কি পূর্বপরিকল্পিত? আমরা এসবের কিছুই জানি না কেন? কে-কিভাবে-কতটুকু লুটপাট করবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

আট. সরকার ও দাতাগোষ্ঠি উভয়েই বলেছে, আদমজীতে বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছে। কে-কখন-কিভাবে দুর্নীতি করেছে–গোপন রাখা হয়েছে এসব কথা। কাঁচাপাট ক্রয়, পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কি পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে, এ বিষয়ে কখনও কোনো তদন্ত করা হয়নি। তবে একথা সত্য যে, গত তিন দশকে যারা এসবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা আনুমানিক ১২ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ দুর্নীতি করেছেন। অথচ সরকারিভাবে লোকসানের পরিমাণ বলা হয়েছে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ আসলে আদমজীর কমপক্ষে ১০ হাজার ৮০০ কোটি টাকা লাভ হয়েছে। এসব তথ্য সত্য হলে আদমজী পাটকল লোকসানী হয় কিভাবে?

নয়. মাত্র ১৭০ কোটি টাকা খরচে আদমজী আধুনিকিকরণ ও বহুমাত্রিকিকরণ (BMRI) সম্ভব ছিল; কিন্তু তা না করে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল কেন? বিশ্বব্যাপী যখন প্লাস্টিক ও পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে– তখন এ ধরণের সিদ্ধান্ত কেন? কার স্বার্থে?

দশ. সত্তরের দশকেও বাংলাদেশে ৮০ লাখ বেল পাট উৎপাদিত হতো আর ভারতে উৎপাদিত হতো ৫০ লাখ বেল। এখন ভারতে উৎপাদিত হচ্ছে বছরে গড়ে ৮০ লাখ বেল আর বাংলাদেশে তার অর্ধেক– ৪০ লাখ বেল। অর্থাৎ আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের উৎপাদন কমছে অথচ ভারতে তা বাড়ছে আর সেখানকার পাট শিল্প বিকশিত হচ্ছে। এসবের অন্তর্নিহিত কারণ কি? কেন এদেশের শিল্প-কৃষি ধ্বংস করার এ মহোৎসব?

এগার. বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি খাতে ছোট-মাঝারি-বড় যে ৭০টি পাটকল আছে, পাটের অভাবে অনেক সময় সেগুলোর উৎপাদন ব্যহত হয়। পাট সংকটের এ কারণ দুর্বোধ্য। কারণ এদেশে এখন বছরে ৪০ লাখ বেল পাট উৎপাদন হয়, আর পাটকলের চাহিদা প্রায় ৩০ লাখ বেল। উদ্বৃত্ত পাটের পরিমাণ ১০ লাখ বেল অথচ রপ্তানি হয় প্রায় ১৭ লাখ বেল। রপ্তানিযোগ্যতা ১৭ লাখ বেল হলে প্রায় ৫০ লাখ বেল উৎপাদন হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে না। কেন? এ প্রশ্নের সরকারি উত্তরটা কি? তা ছাড়া সরকারিভাবে নির্ধারিত মূল্য পাটের মান ভেদে মণ প্রতি ৩৩০ টাকা থেকে ৬৮০ টাকা। অথচ কৃষককে দেওয়া হয় ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে (অন্তত (২০০2) এ বছর তা-ই হয়েছে)। এ হিসেবে বাংলাদেশের পাটচাষী এ বছর ১০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে লোকসান দেবেন। আর পাটের প্রকৃত উৎপাদনমূল্য বিচার করলে লোকসান ২০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে হতে পারে। কৃষকের জন্য পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত না করার কারণ হচ্ছে চোরাচালান উৎসাহিত করা, যে চোরাচালান বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট ভারতের পাটকলগুলোর কাঁচামালের উৎস-বাহক হিসেবে কাজ করে। অতএব সমগ্র মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যব্যবস্থাপনার বিষয়টি একদিকে যেমন দেশজ পাট শিল্প ধ্বংসের কারণ, তেমনি অন্যদিকে চোরাচালান-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠিসমূহকে উৎসাহিত করে এ দেশে কালো অর্থনীতির প্রসার ও ভারতের পাট শিল্পকে পরিপুষ্ট করার মাধ্যম।

বার. স্পষ্ট করে বলা না হলেও শোনা যাচ্ছে যে, পাটজাত পণ্য উৎপাদন নয়, ভারতে কাঁচামাল হিসেবে পাট রপ্তানি করাকেই শ্রেয় মনে করা হচ্ছে। অন্তত বিজিএমএ সূত্র বলছে যে, অতীতের তুলনায় ভবিষ্যতে ভারতে আমাদের কাঁচামাল রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে (১৯৯৯-২০০০ সালে পাট রপ্তানী হয়েছে প্রায় ১৪৮ কোটি টাকার সমপরিমাণ)। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে প্রান্তস্থ অর্থনীতিকে কেন্দ্রের

কাঁচামাল সরবরাহকারী ও কেন্দ্র উৎপাদিত ফিনিশড্ গুডস্-এর ব্যবহারকারী হিসেবে দেখা হতো। আমরা কি পাট কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনীতিতে ফিরে যাচ্ছি? আমরা কি এমন এক অবস্থার দিকে ধাবিত যখন ভারত, থাইল্যান্ড আর চীন থেকে পাটের বস্তা ও পাটজাত দ্রব্য কেনা ছাড়া আর উপায় থাকবে না?

তের. অর্থনীতির কোনো সূত্রই বলে না, মূল্য সংযোজনের (value addition) তুলনায় কাঁচামাল রপ্তানি শ্রেয়। পাটের ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য কারণ পাট প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে আমাদের ৫০ বছরের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আছে। আর সেই সঙ্গে পলিথিনসহ বিভিন্ন কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীব্যাপী প্রাকৃতিক তন্তুর চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

চৌদ্দ. আদমজী পাটকল চালু থাকার সময়, এমনকি গত ২০০১ সালেও পাটের বাজার দর মণপ্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫৫০ টাকার মধ্যে ছিল। অথচ এখন তা ১২০ টাকা থেকে ১৭০ টাকার মধ্যে (এলাকা, মান ও সময়ভেদে) উঠানামা করছে। জমির মূল্য হিসেবে ধরলে পাটের মণপ্রতি উৎপাদন ব্যয় হয় ৬০০ টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত, আর জমির দাম বাদ দিলে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে। সুতরাং পাট বিক্রি করে কৃষক এখন আর উৎপাদন খরচও পোষাতে পারছে না। পাটকল বন্ধ হলে পাটচাষীর অবস্থার আরও অবনতি হবে, ঐতিহ্যবাহি পাট শিল্প ধ্বংস হবে এবং 'সোনালি আঁশ গলার ফাঁস, কৃষকের এখন হাঁসফাঁস' অবস্থা হবে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একথা না বলে বলেছেন, 'পাট হবে নতুন সহস্রাব্দের তন্তু'। এসব বৈপরীত্য কেন?

অকথিত তথ্য আর পাট কেন্দ্রিক বিভিন্ন বৈপরীত্যের তালিকা আর না বাড়িয়ে যা বলা হয়েছে ও যা বলা হয়নি– এ দু'টো মিলিয়ে দেখলে এটুকু দুর্বোধ্য নয় যে, পাটসহ সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের উন্নয়ন বিরোধী একটি রাজনৈতিক-অর্থনীতি যথেষ্ট সক্রিয়, যেখানে বিশ্বপুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষার্থে দাতা-গোষ্ঠির সন্তুষ্টি ও পাট-প্রতিযোগী অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দেশসমূহের দীর্ঘ মেয়াদি স্বার্থ সংরক্ষণই মূল লক্ষ্য।

শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ : অতীত ও বর্তমানের নিরিখে

মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের তোড়ে এদেশে ইতোমধ্যে সৃষ্ট অনুৎপাদনশীল খাত এবং নিকৃষ্ট পুঁজির বিকাশ শর্ত পরিপুষ্ট হচ্ছে। এ কারণেই শিল্পায়নের সম্ভাবনা কাঠামোগতভাবে রূদ্ধ। লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে এদেশ ছিল প্রকৃতই কৃষি প্রধান– মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬০ ভাগ তথা দেশের ৮০ ভাগ মানুষ ছিল কৃষি নির্ভর। তিন দশক পর এখন কৃষির অবদান জাতীয় উৎপাদনের ২৫ ভাগ আর কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ৫০ ভাগ। অর্থাৎ গত তিন দশকে গ্রামীণ মানুষের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ অকৃষি-কর্মকাণ্ড নির্ভর হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের অনেকেই এটাকে উন্নয়নের মাপকাঠি বলে মনে করছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, গত তিন দশকে জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান আদৌ বাড়েনি বললেই চলে (৮ থেকে ১০%)। আর শিল্প খাতের যেসব অংশে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, সেগুলো প্রকৃত শিল্পখাত কি না (প্রশ্নটি জোসেফ কেনেথ এ্যারো উত্থাপন করেছেন[৩]), তা তলিয়ে দেখতে হবে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মৌলিক শিল্প (বা mother industry, যেমন জয়দেবপুরের মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি অথবা চট্টগ্রামের ইস্পাত কারখানা ও জি এম প্লান্ট)সহ দেশজ কাঁচামাল নির্ভর শিল্প (পাটকল) বিলুপ্ত হচ্ছে, অথচ বিদেশি কাঁচামাল নির্ভর হালকা শিল্প (যেমন দর্জি শিল্প, বা তৈরি পোষাক শিল্প অথবা জানালা দরজার গ্রীল বানানোর কারখানা অথবা প্রযুক্তি হস্তান্তরের নামে গছানো পরিবেশ বিপর্যয়কারী শিল্প), যেখানে মূল্য সংযোজন ও সামাজিক উপযোগ অত্যন্ত কম, বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং সামগ্রিক কাঠামোটিই এমন যেখানে এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান

[৩] বিস্তারিত দেখুন, Kenneth J. Arrow, Some Paradoxes of Sustainability : Empirical and Theoretical. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত লোক বক্তৃতা, ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০২।

গড়ে উঠছে না যা সুদৃঢ় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভিত্তির নির্দেশক। শিল্প বিকাশের বিপরীতে যা দ্রুত গতিতে বেড়েছে ও বাড়ছে তা হ'ল সেবা খাত। যেখানে জমি-সম্পত্তি ক্রয়, নির্মাণ কাজ, রিয়াল এস্টেটসহ বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা মিলে একক বৃহত্তম এই খাত মোট জাতীয় উৎপাদনে ৫০ ভাগ অবদান রাখছে। এতে দাঁড়ালোটা কি? কৃষি ও শিল্প– উৎপাদনশীল খাতদুটো পিছে পড়লো, আর জায়গা দখল করলো অপেক্ষাকৃত অনুৎপাদনশীল সেবা খাত। সম্পদবানরা কেন যেন উৎপাদনশীল কৃষি-শিল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে জমিজমা কেনা আর বাড়ীঘর নির্মাণ ও ব্যবসাপাতিতে মনোনিবেশ করলেন। অর্থাৎ বিকশিত হ'ল এক ধরণের নিকৃষ্ট পুঁজি যেখানে বিনিয়োগ বাড়বে কিন্তু উৎপাদনশীল বিনিয়োগ স্থবির হয়ে যাবে এবং এর সঙ্গে নিবিড় সহসম্পর্ক থাকবে বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা, কালো টাকার দাপট এবং এসবের সহায়ক রাজনৈতিক কাঠামোর।

কৃষিকে শিল্পায়নের ভিত্তি বলা হয়। অথচ শিল্পায়নের ভিত্তি হিসেবে কৃষিকে কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পরে কৃষি উৎপাদন নিয়ে বাগাড়ম্বর হয়েছে অনেক। কৃষিতে মোট উৎপাদন (ধানের) বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ; তবে মাথাপিছু উৎপাদন স্থবির। ১৯৭৩-৭৪ সালে মাথাপিছু চালের উৎপাদন ছিল ১৪০ কেজি, ৩০ বছর পরে এখন তা ১৩৮ কেজি। আমন ও আউশের জমি কমেছে, বেড়েছে বোরো চাষ। উৎপাদনশীলতা যে হারে বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বেড়েছে সারের ব্যবহার (৮ গুণ) ও সারের দাম (১৪ গুণ)। উৎপাদন ব্যয় যা বেড়েছে তাতে হিসেব কষে বোঝা দুষ্কর যে, কৃষক এখনও কেন কৃষি কাজ করছেন। কৃষি পণ্যের বাজার মূল্য প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় মেটায় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সম্ভবত অন্য কোনও বিকল্প থাকলে এদেশের কৃষক কৃষি কাজ ছেড়ে দিতেন। এখানে ভর্তুকি উচ্ছেদের বিতর্কে না জড়িয়েও শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, যারা ভর্তুকি উচ্ছেদ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন তারা কিন্তু নিজেদের দেশে কৃষি ভর্তুকির প্রধান প্রবক্তা : যুক্তরাষ্ট্রে বছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ২০ বিলিয়ন ডলার আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে মোট কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ সমগ্র সাব-সাহারান আফ্রিকার সকল দেশের সম্মিলিত মোট জাতীয় আয়েরও বেশি।

যে 'সবুজ বিপ্লব' কৃষিতে অধিক ফলন নিশ্চিত করেছে, সে বিপ্লবই কিন্তু অবলুপ্তি ঘটিয়েছে অনেক প্রজাতির ধানের, হ্রাস করেছে প্রাকৃতিক উর্বরতা, বিনষ্ট করেছে অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদ (পৃথিবীর চতুর্থ শীর্ষ স্থান থেকে এখন ৮৫তম স্থানে), আমদানী করেছে নতুন নতুন পোকামাকড়, প্রাণবৈচিত্র ও জীববৈচিত্র বিনষ্ট করেছে। আর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তিগত বিষয়ে অনেক কিছু বলা হলেও কৃষিসংস্কারের (agrarian reform অর্থে) বিষয়টিকে সব সময় অবহেলা অথবা ভয় করা হয়েছে। অথচ এ দেশে, অন্য কিছু বাদ দিলেও, ৩৩ লাখ একর যে খাস কৃষিজমি ও জলাশয় আছে, যা দরিদ্র মানুষেরই ন্যায্য প্রাপ্য, সে বিষয়ে কোনও সরকারই কখনও আন্তরিক ছিলেন না। এক দিকে কৃষিজমির মালিকানার পুঞ্জিকরণ আর অন্যদিকে খাস জমির জবর দখল– এ নিয়ে ক্ষমতাবানরা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। গত ৩০ বছরে গ্রামীণ ক্ষমতাবান ও শহুরে ক্ষমতাবানদের মধ্যে শক্তিশালী আতাঁতও সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সূত্রে। এ আঁতাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে স্থানীয় সরকারের আসন্ন নির্বাচনে। নিকৃষ্ট পুঁজির বিকাশে এটাও আরেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাংলাদেশী সংস্করণ।

গত তিন দশকে ধানের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত হয়নি। গুটি কয়েক মানুষের হাতে কৃষি সম্পদের পুঞ্জিভবন, গ্রামীণ অর্থনীতিতে লুটেরা-টাউট শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে কৃষি-নির্ভর ব্যাপক জনগোষ্ঠির ভিক্ষুকায়ন ও নিঃস্বায়ন (pauperization) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। নিঃস্বায়িত কৃষক বাধ্য হয়ে অভিবাসিত হয়েছেন– এসেছেন শহরে, প্রথমে একা, আস্তে আস্তে এনেছেন পরিবার-পরিজন। এদিকে শহরে গড়ে ওঠেনি শিল্প কলকারখানা। অতএব গ্রাম থেকে শহরে আসা নিঃস্ব কৃষককে কাজের সন্ধানে ইনফর্মাল সেক্টরে নিম্নমজুরীর কাজে যোগ দিতে হয়েছে, আর বাসের জন্য বেছে নিতে হয়েছে বস্তি। সুতরাং তথাকথিত নগরায়ন আসলে

কিছুই নয়, এটা আক্ষরিক অর্থেই বস্তিয়ায়ন (slumization, not urbanization[4])। উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ ভিক্ষুকায়ন ও নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি এমনটি থাকলে ২০২০ সালে বাংলাদেশে শহুরে জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯ কোটি, যা আমাদের ১৯৮১ সালের মোট জনসংখ্যার সমান। আর এই ঢাকা শহরেই ২০১০ সালে জনসংখ্যা হবে প্রায় দুই কোটি (বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী), যার মধ্যে এক কোটি বাস করবে বস্তিতে। দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে পড়া লুটেরা অর্থনীতিতে নিকৃষ্ট পুঁজি বিকাশের এটাও একটি প্রতিফল। এখানে অনেক কিছুই ঘটবে কিন্তু দেশজ অর্থনীতির ভিত্তি মজবুতকরণ-উদ্দিষ্ট-শিল্পায়ন ঘটবে না।

এদেশের শিল্পের ইতিহাস পুরনো নয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে যে শিল্প খাত গড়ে ওঠে তা তাদের জন্য লাভজনক ছিল। জাতীয়করণ করার ফলে ৭টি সংস্থার অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতই (অনেকেই এটাকে সমাজতন্ত্রের সমার্থক বলে মনে করেন) হয়ে দাঁড়ালো শিল্পের মূল ধারা। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মূল ধারা বিভিন্ন কারণে বিকাশ লাভ করেনি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি খাতে মূলধন গঠন প্রক্রিয়ার সকল বাঁধা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়। গত চারটি শিল্প নীতিতে সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষিত হয় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রাধান্য নিম্ন পর্যায়ে আনতে হবে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের সকল বাধা দূরীভূত করতে হবে এবং সরকারিভাবে সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধে নিশ্চিত করা হবে। আর সেই সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের কাঠামোগত এ্যাডজাস্টমেন্ট নীতিমালাসহ রাষ্ট্রায়াত্ত খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের ফর্দ এসব নিশর্তকরণে জোর সুপারিশ করেছে। এসব সুপারিশের মর্মবস্তু হ'ল জাতীয় পুঁজির বিকাশ রুদ্ধ করতে প্রথমে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ হবে অথবা বিরাষ্ট্রীয়করণ হবে, তারপর বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প বন্ধ হবে; আর এর মাঝে জাতীয় সম্পদ লুটপাট হয়ে যাবে। অথচ বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশ প্রধান এখনও বলছেন রাষ্ট্রায়ত্ব খাত নানা ধরণের অর্থনৈতিক বিকৃতি (economic distortions) সৃষ্টি করে যা বেসরকারি খাত নির্ভর প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে।[৫]

প্রকৃত অর্থে গত তিন দশকে শিল্প বিকাশে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

- রাষ্ট্রায়ত্ত খাত অর্থই লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার, ভর্তুকি নির্ভরতা, নিম্নউৎপাদনশীলতা, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। বিভিন্ন সময় সরকার আর (বিশেষ করে ক্ষমতা গ্রহণের আগে এবং পরপর) দাতাগোষ্ঠি এসব বললেও এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমলা-ব্যবস্থাপক উচ্ছিষ্টভোগী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের চিহ্নিত করা ও শাস্তির প্রয়োজনীয়তা কেউই বোধ করেননি।

- বেসরকারি খাতের বিকাশ মানেই যতটা না নতুন বেসরকারি খাতের উদ্ভব তার চেয়ে বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বিরাষ্ট্রীয়করণ, যেখানে বেসরকারি মালিকদের (আমলা-রাজনীতিবিদের যোগসাজশে) মূল উদ্দিষ্ট হ'ল হাজার হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট করা, শিল্পের বিকাশ নয়। বিষয়টির সর্বশেষ সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ— বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ করে কমপক্ষে এক কোটি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থহানী ঘটানো হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কিত অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সাম্প্রতিক গবেষণা ফলাফল স্পষ্টভাবেই দেখায় যে, এদেশে সরকার প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের কোনও ধনাত্মক ভূমিকাই স্বীকার করে না। এ অস্বীকৃতি ভবিষ্যতের শিল্প বিকাশে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে; সমষ্টিক অর্থনীতিতে বিরাষ্ট্রীয়করণের ধনাত্মক তেমন অভিঘাত নেই; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিরাষ্ট্রীয়করণ সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করেনি; রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সবসময় সরকারি সম্পদ বিনষ্ট করে— এ কথা সত্য নয়; বিরাষ্ট্রীয়করণ পরবর্তী কর্পোরেশনসমূহে আর্থিক লোকসান বৃদ্ধি পেয়েছে; বিরাষ্ট্রীয়করণের ফলে শিল্পের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির

---

[৪] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Barkat Abul and S Akhter, A Mushrooming Population: The Threat of Slumization Instead of Urbanization in Bangladesh, in *The Harvard Asia Pacific Review*, Vol 5, Issue 1, 2001: 27-30।

[৫] দেখুন ফ্রেডারিক ডি টেম্পল, 'বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মূল্যায়ন ও কৌশল', দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ডিসেম্বর ২০০২।

পরিবর্তে কারখানা বন্ধ হয়েছে ও কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে; শিল্প বিকাশে রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা, অঙ্গীকার ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পের বিকাশ কেন্দ্রিক যে বিপরীতধর্মী ও অস্বচ্ছ নীতি নির্দেশনা দেখা যাচ্ছে তা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে মারাত্মক ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বিশেষ গুরুত্বহ মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ

"The available evidence on the experience with privatisation suggests that enterprise closure, disemployment, possible accumulation of liabilities with the banks and possible revenue loss may have to be taken into account as part of the price we pay to improve profitability and reduce claims on the public exchequer...... However, the positive macro-economic impact of privatisation appears to be far from evident. Reports on the profit and loss accounts of the Sector Corporations from which SOEs are being divested, indicate that in the four years, 1979/80-1982/83, prior to the great wave of privatisation under President Ershad, total profits for 6 sector corporations added up to Tk. 1.5 billion and net profits were earned by the SOEs in three out of these 4 years (World Bank, 1985). In 1982/83, the last year prior to the big privatisations, SOE *profits* amounted to Tk. 912 million. This does not suggest that SOEs in Bangladesh were always a net drain on the pubic purse. In 1995/96, at the end of the BNP regime and the privatisation of 131 enterprises with a selling value of 1.8 billion, corporation loses increased to Tk. 3.2 billion (IRBD 1996). This suggests that a central argument for SOE privatisation, the reduction of macro-economic imbalances, appears to be invalid, at least in the context of Bangladesh.

During this period of divestiture, the volume of bank defaults to the commercial banks has also increased. This suggest that reduction of the size of the state sector and expansion of the private sector have brought no relief to the banking system just as it has brought no relief to the exchequer. ….

With a few exceptions, privatised units have not significantly improrved performance but have contributed to enterprise closures and disemployment. Private sector default to the banks has increased exponentially whilst private banks have been characterised by more adverse loan portfolios that the NCBs and have been maledicted to large scale insider trading……

The declared philosophy of the newly constituted *Privatisation Board* is to get SOEs from the public domain as fast as possible. This approach indicates some indifference as to whether such units, once privatised, are closed down these units will have to account for their accumulated liabilities to the banking system.

Such an approach to privatisation implies a certain innocence of vision in charting Bangladesh's future development landscape and the industrial strategy to be located within this design. In the prevailing policy vacuum, the current approach to privatisation thus appears to have introduced an entirely new logic to the divestiture process……..

A further hazard to Bangladesh's development prospects arises from the implications of a policy which envisages no future role for *public enterprise* in the manufacturing sector……

By the time of the expiry of the *Multi Fibre Agreement* (MFA) in 2005, Bangladesh will have to establish backward linkages with a modernised textile industry which can produce the yarn and fabric needed to service Bangladesh's RMG sector. Unless Bangladesh can convert its RMG sector from a two-stage processing industry to a three-stage enterprise, after 2005, the *rules of origin* clause in the WTO could deny Bangladesh's RMG exports entry to a large part of their traditional markets in Europe and North America. This involves putting in place, within Bangladesh, a domestic manufacturing capacity to produce 2 billion metres of fabric. This involves setting up around 375 new weaving mills and 290 new spinning mills, involving an investment of around US$ 5 billion. On all counts, making of most optimistic assumptions, Bangladesh's private entrepreneurs expect to mobilise only a fraction of such resources for which they will need to assume the risk taking burden for realising such a volune of investment. In such circumstances should the state remain idle and make no attempt to put any productive capacity in place,, even if this means a loss of RMG markets to India and China who already preside over large integrated textile industries and are planning major investments for the post-MFA era? The failure to address this dilemma provides the source of the present contradictions inherent in Bangladesh's privatisation policy. This could have potentially fatal implications for Bangladesh's future development" (Rehman Sobhan, Privatisation in Bangladesh: An Agenda in Search of a Policy, CPD Occasional Paper Series, August 2002: 16-19).

- শিল্প খাতে সরকারি ভূমিকা ও সামগ্রিক পরিবেশ কখনও শিল্প সহায়ক ছিল না। আশির দশকে যখন বলা হলো যে, বাণিজ্য ও সেবা খাতে বিনিয়োগের তুলনায় বেসরকারি শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে ৪ গুণ, তখন বাস্তবে ঘটলো ঠিক উল্টোটি। বিকশিত হ'ল বাণিজ্য ও সেবা খাত; আর শিল্প খাতের মধ্যে রফতানিমুখী হালকা প্রযুক্তি নির্ভর শ্রমঘন ঠিকাদারি গোছের দোকানদারী শিল্প। নিকৃষ্ট পুঁজি বিকাশের এ আর এক নমুনা।

- বিকাশের ধারাটি আমাদের এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, এখন শিল্পের চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য লাভজনক, আর ব্যবসার চেয়ে চোরাচালান লাভজনক। সুতরাং পুঁজির গতিমুখ চোরাচালানমুখী– শিল্পায়নমুখী নয়।

- শিল্প খাতে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ শিল্পমুখী কিনা– সে কথাও প্রশ্নসাপেক্ষ। বিদেশি পুঁজির বড়জোর ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ হচ্ছে শিল্পখাতে, আর কমপক্ষে ৭০ শতাংশ ব্যবসায়ে। সেই সঙ্গে মারপ্যাচের বিষয় হ'ল– বিদেশি পুঁজি বিদেশাগত কি না (নাকি পূর্বে বিনিয়োজিত পুঁজির আয়), মূলধনী দ্রব্যাদির আমদানি কতটুকু ইত্যাদি। প্রশ্নগুলি উত্থাপন করা জরুরি অন্তত এজন্য যে, ভবিষ্যতে তেল-গ্যাস খাতে যে বিদেশি বিনিয়োগ হতে পারে তার ৮০-৯০ ভাগ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে– এ নিশ্চয়তা কোথায়? বৈদেশিক পুঁজির সরাসরি বিনিয়োগ বছরে প্রায় ১৬ কোটি ডলার (দক্ষিণ এশিয়ায় সর্ব নিম্ন– নেপাল ছাড়া) অথচ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১৮৮ কোটি ডলার। আশাব্যাঞ্জক ঘটনা, কিন্তু হুন্ডিসহ বিভিন্ন মুদ্রা পাচার সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের শক্ত ভিত্তি– এ ক্ষেত্রেও দুর্বৃত্তায়ন বৃদ্ধি করছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্ভাবনাও ক্ষীণ।[৬] পাশাপাশি একথাও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নিজস্ব অর্থনীতির ভিত্তি (শিল্পায়ন যার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড) দুর্বল হলে বৈদেশিক বিনিয়োগও অলাভজনক হতে পারে।

- শিল্প বিকাশে সরকারি অবহেলার সবচে' উৎকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল ক্ষুদ্র শিল্প যা এ দেশের নিজস্ব, সৃজনশীল, গতিশীল। এসব শিল্প পারিবারিক শ্রম ভিত্তিক এবং স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম। অথচ এরা সব ধরণের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত। অবাধ আমদানি যেমন এসব ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি মুদ্রা-অবমূল্যায়নের ফলে যে রফতানি হয়, সেক্ষেত্রেও এদের ক্ষতি। বিশ্বায়নের তোড়ে দেশজ এসব ক্ষুদ্র পারিবারিক সৃজনশীল শিল্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার আশঙ্কা আছে– সেক্ষেত্রে এখন থেকে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপর্যয় অনিবার্য।

- আমাদের দেশে শিল্প খাতে গঠনগত পরিবর্তনের ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। রপ্তানি কমেছে প্রাথমিক পণ্যের, আর বৃদ্ধি পেয়েছে সংকীর্ণ ভিত্তির প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের। রপ্তানী আয়ের উৎসগত দিক থেকে পাট, পাটজাতদ্রব্য ও চা-এর বিলুপ্তি ঘটেছে বলা চলে; আর বৃদ্ধি পেয়েছে তৈরি পোশাক (যেখানে আবার মূল্য সংযোজন সর্বনিম্ন) খাতে। অর্থাৎ তৈরি পোশাক শিল্পকে (টেইলারিং শপ) শিল্প খাতে না ধরলে রপ্তানি আয়ে শিল্পের অবদান হ্রাস পাবে। শুল্ক ও কোটামুক্ত বিশ্বায়নে অগ্র-পশ্চাদ্ সংযোগ শিল্পের অনুপস্থিতিতে আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প ভিত্তিক রফতানি বাণিজ্যে যে বড় ধরণের ধস নামতে পারে (২০০৪-এর পরে), এ বিষয়ে ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। গত তিন দশকে আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় এবং সরকার আমদানি-রফতানির বিভিন্ন বিধিনিষেধ শিথিল বা প্রত্যাহার করায় একদিকে দেশজ শিল্পের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অন্যদিকে চোরাচালান আর ভোগ্যপণ্য নির্ভর আমদানি উৎসাহিত হয়েছে। ফলে কৃষির বিকাশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে– বিষয়গুলি গুরুত্বসহ ভাবতে হবে। কারণ বিশ্বায়নের যুগে একদিকে যেমন স্ব-স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাণিজ্যের লড়াইটা সমাসন্ন তেমনি অন্যদিকে ঋণ-সাহায্য প্রবাহ ক্রমহ্রাসমান (জিডিপি-র অনুপাতে)।

বিকশমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোটিই মানবকল্যাণবিমুখ এবং শিল্পায়ন বিরোধী

[৬] উল্লেখ্য যে, বিশ্বায়নের কারণেই বিনিয়োগকারীরা চাইবেন যথার্থ বিনিয়োগ পরিবেশ। এ জন্য যে তেরোটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে, তার প্রথমটি বাদে অন্য কোনটি বাংলাদেশে নেই। প্রথমটি, অর্থাৎ স্বল্প মজুরে শ্রম আমাদের একমাত্র সুবিধার দিক। এ ছাড়া কাঁচামাল, অবকাঠামো, বিভিন্ন ধরনের শুল্ক ও করভার, শ্রমঅসন্তোষমুক্ত পরিবেশ, কাগজপত্রের দ্রুত চলাচলের নিশ্চয়তা, উন্নত ব্যাংকিং ব্যবস্থা, দুর্নীতিহীনতা বা স্বল্প দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা, সুশাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সর্বোচ্চ মুনাফা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, মুনাফা ইচ্ছামাফিক ব্যবহারের পরিবেশ–এ বারোটি বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থা নেতিবাচক। আবার এ কথাও সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ পরিবেশে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু চিরাচরিত পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বিকশিত হয়নি; বিকশিত হয়েছে সবধরনের নিকৃষ্ট পুঁজি যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ভূমিকা রাখে না। একচেটিয়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মুক্তবাজার এদেশে জাতীয় পুঁজি ভিত্তিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়ে প্রতিবন্ধক। গত তিন দশকে এদেশে জাতীয় আয় (মোট ও মাথাপিছু) বৃদ্ধি পেয়েছে; সরকারি হিসেবে দারিদ্রের আপাতন কমেছে; বেড়েছে শিক্ষার হার; হ্রাস পেয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার; শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে শিশুদের টিকা দান; পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহারকারী বেড়েছে; মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সচলতা (ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে) বৃদ্ধি পেয়েছে; জীবনের আয়ুস্কাল বেড়েছে– এসব বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই, দ্বিমত আছে এসব নিয়ে গুণকীর্তনে। কারণ এগুলোর অধিকাংশের সঙ্গে সরকারি সচেতন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই; এগুলোর অধিকাংশই সময়ের ব্যাপ্তিতে অতি সাধারণ প্রক্রিয়া মাত্র; আর এগুলোর কোনোটিই কার্যকারণগতভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের মূল প্রবণতাসূচক নয়।

কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে গত তিন দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা দিয়ে বলা যাবে যে, মানবকল্যাণমুখী স্বাধীনতার চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদ-হীন মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার দূরত্ব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। আমাদের সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব 'মৌলিক চাহিদা' পদ্ধতিতে হিসেব করলে দারিদ্র বিমোচনে জাতীয় ক্ষেত্রে সময় লাগবে ৩১০ বছর, আর গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে সময় লাগবে ৯০৯ বছর। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ভেতর আর যাই থাক, গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে ১০০০ বছরের কর্মসূচির কথা ছিল না। প্রশ্নাতিত প্রশ্ন– সমস্যাটি কোথায়? নিশ্চয়ই স্বাধীনতার গত ৩০ বছরে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বড় মাপের এমন কোনো গলদ ছিল যা এদেশে মানব কল্যাণ নিশ্চিত করতে দেয়নি। নিশ্চিত করেনি কৃষির উন্নয়ন ও দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তি। সম্ভবত কাঠামোগত রূপান্তর যা ঘটেছে তা মানবকল্যাণবিমুখ ও শিল্পায়নমুখী নয়।

দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে– এ কথা সত্য। তবে গত তিন দশকে বিকাশের ধারা ১৪ কোটি মানুষের আমাদের দেশকে সম্ভবত সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভাজিত করেছে :

- প্রথম ভাগে আছেন সংখ্যালঘু ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ১০ লাখ; আর
- দ্বিতীয় ভাগে আছেন সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে ১৩ কোটি ৯০ লাখ।

সুতরাং রাজনৈতিক-অর্থনীতির মারপ্যাচে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অবস্থা যেখানে ১০ লাখ ক্ষমতাধরের বিপরীতে আছেন ১৩ কোটি ৯০ লাখ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্থ বঞ্চিত মানুষ। প্রকৃত অর্থে এই বিশাল ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন অথবা inclusion of the excluded– এ বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সচেতন কোনো প্রয়াস কখনও নেওয়া হয়নি (পরিকল্পনা দলিল দস্তাবেজে যাই থাক না কেন)। উল্টো, ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল ও আছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ তা-ই নির্দেশ করে।

সরকারে– নির্বাচিত ও অনির্বাচিত নির্বিশেষে– যারাই ছিলেন, সকলেই প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে, উন্নয়নই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য, তারা দারিদ্র বিমোচন করেছেন আগের তুলনায় অধিক। দাবিটি মিথ্যা, যথেষ্ট প্রতারণামূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। 'উন্নয়ন' হয়েছে, তবে তা সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়, ঐ ১০ লাখ ক্ষমতাধরের। অর্থাৎ যে 'উন্নয়ন' হয়েছে তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। excludd-রা সব সময় excluded-ই রয়ে গেছেন। আর excluded-দের উন্নয়নের ধারায় include করার প্রয়াস ক্ষমতাধরদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ

সংশ্লিষ্ঠতার কারণেই বৈরী অন্তর্ভুক্তিকরণ (adverse inclusion)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। তা-ই যদি না হবে তাহলে প্রায় ১৪ কোটি মানুষের এ'দেশে–

- আয়ের অথবা খাদ্য গ্রহণের নিরিখে ৬-৭ কোটি মানুষ এখনও দরিদ্র– কেন? (মৌলিক চাহিদার মূল্যমানের নিরিখে– দারিদ্রের নিম্নরেখার মাপকাঠিতে সংখ্যাটি আরো ২-৩ কোটি বেশি)
- প্রায় ৮ কোটি মানুষ এখনও কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত– কেন? (যদিও এ অধিকার সম্পর্কে সংবিধান সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা দেয়)
- প্রায় ৯ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সেবার সুযোগ বঞ্চিত– কেন?
- প্রতিবছর যে ৬ লাখ মানুষ এদেশে মৃত্যুবরণ করেন তার অর্ধেকই ৫ বছরের শিশু – কেন? আরও লজ্জাজনক কথা, ৫০% ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র-উদ্ভুত ব্যাধি– নিউমোনিয়া (যার চিকিৎসা ব্যয় মাত্র ১৩ টাকা), ডায়ারিয়া (১৭ টাকা), হাম (১২ টাকা), ও যক্ষা (৯০০ টাকা)। উল্লেখ্য, যক্ষা রোগীর সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান চতুর্থ শীর্ষে।
- প্রায় তিন কোটি স্বাক্ষর-নিরক্ষর মানুষ (যাদের অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার– কেন?
- প্রায় ১১ কোটি মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত– কেন?
- সীমিত আয়ের ব্যপক সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত– কেন?
- দেশের অধিকাংশ নারী, শিশু ও প্রবীণ নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত– কেন?
- ব্যাপক জনগোষ্ঠি নিশ্চিতভাবেই উত্তরোত্তর অধিক হারে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছেন– কেন?
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা চিরস্থায়ী হচ্ছে – কেন? (শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাচে ইতোমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫০ লাখ মানুষের ২০ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি জবর দখল হয়েছে যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৯০ হাজার কোটি টাকা। এই জোর-দখলকারীরা আমাদের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ (ক্ষমতাবান/ক্ষমতাধর গোষ্ঠিভুক্ত)। আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসীরা কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য– সব দিক থেকেই প্রান্তস্থ)।

এসব বঞ্চনা-মুক্তির নামই যদি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তি হয়, সেক্ষেত্রে গত তিন দশকে অর্থনৈতিক ইতিহাসকে মানব কল্যাণে ব্যর্থতার ইতিহাস হিসেবে অভিহিত করলে বিশেষ ভুল হবে না। এ ব্যর্থতা শিল্পায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। এ ব্যর্থতা শিল্পায়ন বিরোধী। এ হেন অবস্থায় সুন্দর-সুস্থ ভবিষ্যৎ সকলেরই কাম্য; কিন্তু সম্ভবত বিজ্ঞানসম্মত কোনো প্রক্ষেপণই সেদিকে সায় দেয় না।

গত তিন দশকে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ– আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার সূচক-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান যা-ই বলুক না কেন– জীবন পরিচালনে অতিশয় কষ্টক্লেশ করেছেন, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সময়ে কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা সংস্কৃতি– সর্বত্র এক আত্মঘাতি লুণ্ঠন সংস্কৃতি (culture of plundering) জেঁকে বসেছে। এই লুন্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, সন্ত্রাস, পেশি শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন ইত্যাদি। আমরা জানি, লুণ্ঠন পুঁজিবাদ বিকাশে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে; কিন্তু এ-দেশে আত্মঘাতি লুণ্ঠন প্রক্রিয়া জাতীয় পুঁজি বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে। তা না হ'লে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি বন্ধ হবে কেন? কেন বন্ধ হবে দেশজ ব্যক্তিখাতের কল-কারখানা? কেন ব্যক্তিখাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান অনুৎসাহিত হবে?

সামাজিক-রাজনৈতিক গণমুখী রূপান্তর বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণে আশাবাদ ব্যক্ত করা কঠিন, তা স্বাধীনতাত্তোর অর্থনীতির হরিলুট সংস্কৃতির কয়েকটি দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলেই সহজে বোঝা সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনীতি আসলে এক গভীর 'দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে' (criminalization trap) পড়েছে। দুর্বৃত্তায়নের এ কাঠামোতে দেশজ শিল্পায়ন সম্ভাবনা যে নেই বললেই চলে, তা দুর্বৃত্তায়নের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই সহজে অনুমান করা যায়:

- অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন (criminalization of economy) জিইয়ে রাখতে ও অর্থনীতিকে অধিকতর দুর্বৃত্তায়িত করার স্বার্থে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন (criminalization of politics) হয়েছে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ফাঁদ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করেছে; আর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করছে। দুর্বৃত্তায়নের এ ফাঁদ শিল্প-বিকাশ সহায়ক নয়।
- গত তিন দশকে বছরে সরকারিভাবে যে ১৮০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য এসেছে, তার ৭৫% লুন্ঠন করেছেন অর্থনীতি–রাজনীতির দুর্বৃত্ত গোষ্ঠি। ফলে ক্ষমতাধররা অধিকতর ক্ষমতাবান হয়েছেন আর ক্ষমতাহীনদের অক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতাহীনরা শিল্প বিকাশ চাইতে পারেন, কিন্তু ক্ষমতাবানরা যে নিকৃষ্ট পুঁজির বাহক সে পুঁজি শিল্পায়ন বিরোধী।
- ক্ষমতাবানেরা এক ধরণের নিকৃষ্ট পুঁজির (ব্রিফকেস পুঁজি বা কমিশন/দালাল পুঁজি) মালিক হয়েছেন, যে পুঁজি অনুৎপাদনশীল, উৎপাদনশীল বিনিয়োগে যার কোনোই ভূমিকা নেই। সুতরাং শিল্পায়ন প্রায় অসম্ভব।
- ক্ষমতাবানেরা এখন কালো অর্থনীতির একটা বলয় সৃষ্টি করেছেন, যে দুষ্টচক্রে বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকার সৃষ্টি হয়, যা জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ। এ বলয়ে যাদের অবস্থান তারাই আবার ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি (লুন্ঠন সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে ঋণখেলাপি সংস্কৃতি)। এরাই বছরে ১১ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িত; এরাই বছরে কমপক্ষে ২০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ মুদ্রা পাচার (money laundering) করছেন। এরাই বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্পের মালিক হতে আগ্রহী, তবে তা শিল্প বিকাশে আগ্রহের কারণে নয়; এরাই অর্থনীতির স্থবিরতার জন্য দায়ী। এরাই আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে এবং/অথবা তাকে ব্যবহার করে সরকারকেও ঋণখেলাপিতে রূপান্তরিত করেছেন। এরাই রাষ্ট্রক্ষমতা ও সরকারকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক বিকৃতি সৃষ্টি করেন যা অপচয় বৃদ্ধিতে সহায়ক। এসব কালো অর্থনীতির কর্মকাণ্ড শিল্পায়ন বিরোধী।
- দুর্বৃত্ত-বেষ্টিত সরকার তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে যত না মানুষকে গুরুত্ব দেয় তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় লুণ্ঠনের খাত সমূহকে। যেমন যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা সম্ভব তা দিয়ে কেনা হয় যুদ্ধ বিমান। বাজেট ঘাটতি হবে, অথচ অনুৎপাদনশীল ব্যয় উদ্বৃত্ত হবে। এ সব কোন্ ধরণের মানব-হিতৈষী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত? এ ধরনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত শিল্পায়ন বিরোধী।
- ক্ষমতাবান দুর্বৃত্তদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে যা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক মূলবোধ বিরোধী এবং সে কারণেই জাতীয় পুঁজির শিল্পায়ন-মুখী বিকাশ বিরোধী—

  - যেখানে জীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে পুর্ণাঙ্গ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হচ্ছে,
  - যেখানে নির্বাচন মানেই কালোটাকার প্রতিযোগিতা (গত জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট ব্যয় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা),
  - যেখানে সন্ত্রাস-সহিংসতা অনিবার্য ও নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়,
  - যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবমাননা সাধারণ নিয়ম,

- যেখানে সরকারি গণমাধ্যম মানেই স্তুতি প্রচারের যন্ত্র,
- যেখানে গণমাধ্যমসহ মানব-মুখী সকল মাধ্যম দ্রুত বন্ধ করতে হয়,
- যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টি নেহায়েতই টোকেনইজম (স্লোগান),
- যেখানে সুশাসন বিষয়টি অতিমাত্রায় উচ্চারিত কিন্তু প্রকৃতই মূল্যহীন,
- যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেহায়েতই কাগুজে,
- যেখানে মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা কেন্দ্রিক ব্যবসা সবচে' লাভজনক,
- যেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিচালকেরা স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্র পর্যন্ত সন্ত্রাসে মদত দিতে বাধ্য,
- যেখানে প্রয়োজনে ক্ষমতাধরদের গণতন্ত্র, অথবা গণতন্ত্র ও বাহিনী শাসনের সংমিশ্রণ, অথবা স্বৈরতন্ত্র যে- কোনোটিই চলতে পারে— ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠির রায় থাকুক বা না থাকুক, ইত্যাদি ।

এহেন অর্থনৈতিক বিকাশ প্রবণতার নিট ফল দাঁড়িয়েছে এমন যে, বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে হয় সুস্থ কোনও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রক্ষেপণ এ মুহূর্তে অসম্ভব অথবা আমরা সম্ভবত একটি বড় রকমের সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘাতের সকল শর্ত পূরণ করেছি । ক্ষমতাহীন ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ ১০ লাখ ক্ষমতাধর মানুষকে অবিশ্বাস করেন; সম্ভবতঃ ঘৃণাও করেন । ক্ষমতাহীন মানুষরা রাষ্ট্র, সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্ভবত আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন– তাদের ক্ষোভ গুমরাচ্ছে কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না । ক্ষমতাহীন মানুষরা একধরণের 'তাতে কিছুই যায় আসে না' (indifferent) মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ।

গত তিন দশকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে যেখানে গুটি কয়েক ক্ষমতাধর মানুষ সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে দুর্বৃত্তায়িত করেছেন । তারা সর্বশক্তিমান । তারা উল্টো পথের নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন । গণদারিদ্র তাদের জন্য আশির্বাদ । অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ (ক্ষমতাহীন) মানুষ তিন দশক ধরে জীবনজীবিকা পরিচালনে যেভাবে নিরন্তর অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন সে জন্য তাদের সাহস, ধৈর্য, নিষ্ঠা, সৃজন ক্ষমতা, ও সততায় মুগ্ধ হতেই হয় । প্রশ্ন হ'ল– স্বাধীনতা চেতনার সঙ্গে সাযুজ্যহীন অথবা বিপরীতধর্মী এই সমীকরণ কি চিরস্থায়ী হতে পারে? তিন দশকে বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এই বিশ্বাস জাগে যে, বিকাশ প্রবণতার চাকাটি এখন যে পথে ঘুরছে তা উল্টো দিকে ঘুরবে– সেটাই অনিবার্য । সমাজ রূপান্তরের এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে বড় মাপের রাজনৈতিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট । তা কবে, কখন, কিভাবে ঘটবে তাই দেখার বিষয় । সম্ভবত সামনে আরও একটা সংগ্রাম প্রক্রিয়া– যা নিশ্চিত করবে জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যেটা ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষার মর্মবস্তু । অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-এর ফাঁদ থেকে উত্তরণ ব্যতীত মহাবিপর্যয় রোধের বিকল্প নেই । বিলম্ব অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে । জনকল্যাণমুখী এই উত্তরণের প্রধান পূর্বশর্ত এক ধরণের রাজনৈতিক পরিবর্তন নিশ্চিত করা, যে পরিবর্তনে সম্মিলন ঘটাতে হবে উষ্ণ হৃদয়, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাহসী দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের সঙ্গে জনগণের সুদৃঢ় অংশগ্রহণ (substantive public actions) । এ ধরনের রাজনৈতিক-সামাজিক রূপান্তরই টেকসই শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও মানবকল্যাণমূখী অর্থনীতির ভিত্তি বিনির্মাণ করতে সক্ষম ।

একটি একান্ত পর্যবেক্ষণ : উন্নয়ন চিন্তার বিকল্প জ্ঞান ভিত্তি প্রয়োজন

বিশ্ব নিয়ত পরিবর্তীত হচ্ছে । সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সংকট পরবর্তী বিশ্ব আগের তুলনায় ভিন্ন, একমেরুকৃত । বিশ্বায়ন বিশ্বকে পাল্টাচ্ছে । ওলট-পালট হচ্ছে । আমরা পাল্টাচ্ছি । পাল্টাচ্ছে নেতা, আমলা, ব্যবসায়ী, কালো টাকার মালিক । সাধারণ মানুষও আগের মত নেই । ১১ সেপ্টেম্বর পরবর্তী বিশ্ব অতীতের তুলনায় ভিন্ন । একমেরুর বিশ্ব দখল করতে চায় অন্য সকলের সম্পদ ও বাজার । ধরা যাক যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে

যুদ্ধ শুরু করলো। বিশ্ব আরও নতুন রূপ নেবে। কেমন হবে সে বিশ্ব; আর সে বিশ্বে বাংলাদেশে আমাদের ভূমিকা ও উন্নয়ন কৌশল কি হবে? ধরা যাক আগামী কাল বর্গি-ফিরিঙ্গি-ডোনাররা এক যোগে প্লেনে উঠে এদেশ ছেড়ে দিল। বিশ্বব্যাংক তার নিজের স্বার্থের প্রতি নিষ্ঠাবান। ধরা যাক, আমাদের সব কিছুতেই পরামর্শ দেওয়া যাদের অভ্যাস অথচ যাদের আমরা পছন্দ করি না তারা আর নেই। আমরা কি করবো? নিজেকে আমাদের নিজেদের চালানোর যোগ্যতা ও প্রস্তুতি কতটুকু? আমার ধারণা জটিল সমীকরণের এসব বিষয় চিন্তা ও বিশ্লেষণে আমাদের পূর্ণ মাত্রায় গলদ আছে। আমরা পরিবর্তন, রূপান্তর-এর যে কথা বলছি তার কৌশল কি হবে? সম্ভবত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে Paradigm shift প্রয়োজন। সম্ভবত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের inherent অক্ষমতা ও চিন্তার দৈন্য আছে। সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্রসহ অনেকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হতে পারে। তবে ঐ shift নিশ্চিত করার প্রথম ও প্রধান শর্ত হবে সত্যকে নির্মোহভাবে আলিঙ্গন করার যোগ্যতা অর্জন। আশার কথা, এ দেশের সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজে এক ধরণের আত্মানুসন্ধানের ধারা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেখানেও রয়েছে আত্মপ্রবঞ্চনা, ছলনা, দোদুল্যমানতা, সত্যানুসন্ধানে বস্তুনিষ্ঠতার অভাব, বৈপরীত্য, বিচ্যুতি। তবে নির্মোহ সত্যানুসন্ধানের আকাঙ্খা কম হলেও আছে। এ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে নতুন জ্ঞান ভিত্তি সৃষ্টি হবে। যে ভিত্তিতে গভীর মূল্যায়ন ভিত্তিক চয়নের স্বাধীনতার পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে। সুতরাং নির্মোহ সত্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হবে। আর সেই আবিষ্কৃত সত্য যত রূঢ়ই হোক তাকে গ্রহণ করার মানসিক কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। উভয়ই নিঃসন্দেহে একটা বড় মাপের কাজ।